স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

ইবোলা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণঘাতী এই ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব

ডাঃ রীনা দাস, আইসিডিডিআর,বি

ইবোলা ভাইরাস রোগ বা ইবোলা হেমোরেজিক জ্বর (Ebola virus disease/Ebola haemorrhagic fever) ইবোলা নামক একটি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে এই রোগ বর্তমানে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এরপর তেমন না-ছড়ালেও বর্তমানে এই রোগ আবার মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে এবং অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে।

ইবোলা কী

ইবোলা সম্পর্কে শুরুতেই সংক্ষেপে বলা যায় যে, এটি প্রতিষেধকবিহীন একটি ছোঁয়াচে জ্বর যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। এপ্রিলের শুরুর দিকে জানান দিয়ে ইতোমধ্যেই আফ্রিকার কঙ্গোতে ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ গিনি, লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওন ছেড়ে ইবোলা এখন ধীরে ধীরে এশিয়া এবং ইউরোপের দিকে এগোচ্ছে।

ইবোলা ভাইরাস আগে রক্তপাতজনিত জ্বর [Ebola haemorrhagic fever (EHF)] হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলো। ইবোলা মূলত একটি আরএনএ ভাইরাস। এর নামকরণ করা হয়েছে কঙ্গোর ইবোলা নদীর নামে। ইবোলা ভাইরাস-গোত্রের ৫টির মধ্যে ৩টি প্রজাতি মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়ে গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। বাকি ২টি মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে জায়ার (Zaire) ইবোলা ভাইরাস। জায়ার কঙ্গোর পুরানো নাম যেখানে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসে কোনো মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলো। প্রথমবার এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ছিলো ৯০ শতাংশ। ভয়াবহ এই ভাইরাসটি মানবদেহে রক্তপাত ঘটায়। লিভার ও কিডনিকে অকেজো করে দেয়, রক্তচাপ কমিয়ে দেয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে দেয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত করে।

ইবোলা ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশের পর কয়েকদিন থেকে প্রায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো লক্ষণ প্রকাশ না-করেই অবস্থান করতে পারে—অর্থাৎ এর লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২১ দিন লাগতে পারে। ফলে, আক্রান্ত ব্যক্তি এই রোগ নিয়ে চলে যেতে পারেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে আর সেখানে নিজের অজান্তেই এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ইবোলার লক্ষণ

- ইবোলা-আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে হালকা জ্বর, মাথা-ব্যথা এবং শরীরব্যথা অনুভব করে; কিছুদিন পর তীব্র মাথাব্যথা ও জ্বর দেখা দেয় এবং রোগী শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে
- ত্বকে দানা-দানা দাগ দেখা দেয়
- মুখে ঘা হয়
- ডায়রিয়া এবং মারাত্মক বমি শুরু হতে পারে
- চূড়ান্ত পর্যায়ে শরীরের ভিতরে ও বাইরে রক্তপাত শুরু হতে পারে
- আক্রান্ত ব্যক্তির লিভার, কিডনি, হৃদপিণ্ড অকেজো হয়ে তার মৃত্যুও হতে পারে

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণ ফ্লুর মতোই। সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা, বমি, ডায়রিয়া এবং জ্বর এই রোগের প্রাথমিক উপসর্গ। তাই, কারো উপরোক্ত কোনো উপসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। রক্ত

ইবোলা ভাইরাস

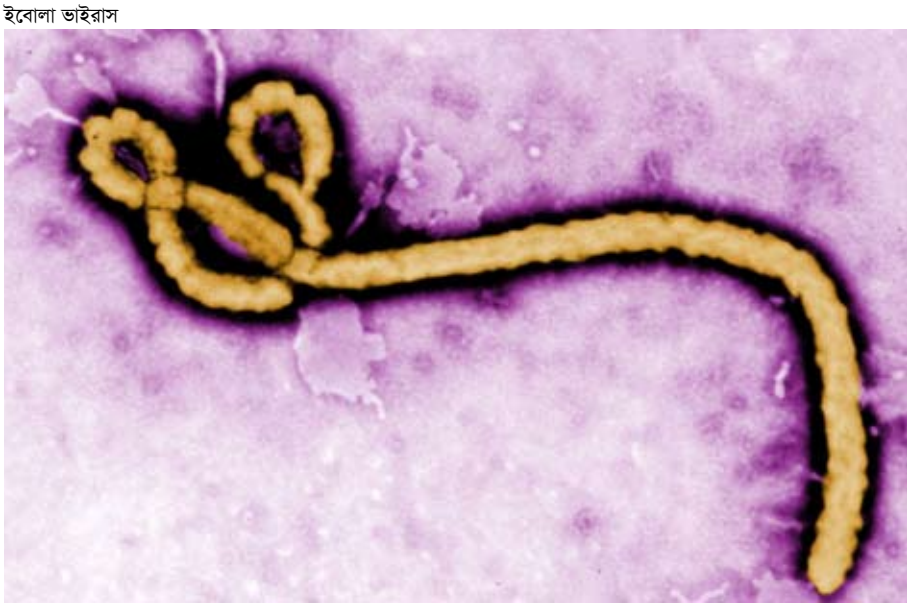

ভেতরের পাতায়

- চিকুনগুনিয়া
- হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) এবং জরায়ুমুখের ক্যান্সার
- শিশুদের জ্বরজনিত খিঁচুনি
- ধুমপান বিষপানের সামিল

বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ২

অগ্রহায়ণ ১৪২১ | ডিসেম্বর ২০১৪

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	অধ্যাপক জন ডি. ক্লিমেন্স
উপ-প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ রুখসানা গাজী, ডাঃ মোঃ ইকবাল, ড. রুবহানা রকিব, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

ইবোলায় আক্রান্ত রোগীর হাত

পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এটা ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, কলেরা বা অন্য কোনো রোগের জীবাণুর কারণে হচ্ছে কি না।

এই রোগ কীভাবে ছড়ায়

ইবোলা ভাইরাসজনিত রোগ মানুষ ও অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রাণী, যেমন গরিলা, শিম্পাঞ্জীসহ গৃহপালিত শুকরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি রোগ। বলা হয়ে থাকে, বাদুড়ের খাওয়া ফল খেয়েই ইবোলা ভাইরাস মানুষের দেহে প্রথম প্রবেশ করে এবং পরবর্তীকালে তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে শুরু করে। ইবোলা-আক্রান্ত মানুষের দেহরস (body fluids) অপর কোনো মানুষের দেহের সংস্পর্শে আসলে সেই ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরও ভাইরাসটি বেশ কয়েকদিন টিকে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে এই রোগে মৃত্যুর হার ৫০-৯০%।

আশার কথা হলো, রোগটি ফ্লু এবং অন্যান্য বায়ুবাহিত রোগের মতো ছড়ায় না, আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে না-আসলে এই রোগে সংক্রামিত হওয়ার ভয় নেই।

প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণে পশ্চিম আফ্রিকায় এপর্যন্ত পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী 'জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আমাদের দেশেও সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন কেননা একবার যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা এর সংক্রমণ ঘটে যায়, তাহলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

চিকিৎসা

শরীরের পানিশূন্যতা রোধ (রিহাইড্রেশন) এবং হালকা বেদনানাশক দিয়ে ইবোলা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করা হচ্ছে। খুব একটা কার্যকর কোনো ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। কোনো প্রতিষেধক টিকাও নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই রোগের লক্ষণগুলো অন্য আরো অনেকগুলো রোগের লক্ষণের সাথে মিলে যায়। ফলে, রোগ শনাক্ত করতে সময় লেগে যায়। তাই সঠিক রোগ শনাক্ত করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়াটাও অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। তবে, যদি রোগ দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং সঠিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া যায় তাহলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

হোমিওপ্যাথির দ্বারা এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চলছে এবং ভবিষ্যতে সফলতা আসতে পারে।

ইবোলা ভাইরাস-সংক্রান্ত ৩টি ভয়াবহতা

১. এই ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয় নি
২. এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ। সাধারণত শরীরের ভিতরকার তরলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। রোগীর মৃত্যুর পর মৃতদেহে এই ভাইরাস জীবিত থেকে যায় এবং অন্যান্য মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে
৩. দশ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে যায়

ইবোলা সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের যা জানা প্রয়োজন

যেহেতু পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, দ্য সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পশ্চিম আফ্রিকার ইবোলা-আক্রান্ত দেশগুলোতে ভ্রমণ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতকর্তা জারি করেছে।

আমাদের করণীয়

যেহেতু এ-রোগের কোনো টিকা আবিষ্কৃত হয় নি সেহেতু এই ভাইরাসটি যাতে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না-পারে এ-ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয় তবে তাকে কিভাবে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে সেই ব্যাপারেও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এই ভয়াবহ ভাইরাসটি যাতে কোনোভাবেই আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়তে না-পারে সেই বিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সতর্কতা হিসেবে যা যা করণীয়:

- সবসময় সাবান ও গরম পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে
- খেয়াল রাখতে হবে যেন হাত না-ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে হাত লাগানো না-হয়
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে যাওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে
- আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের কোনো প্রকার তরল যাতে আপনার সংস্পর্শে না-আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- যদি কোনো কারণে এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তবে সাথে সাথে নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে যাতে অন্য কেউ এ-রোগে আক্রান্ত না-হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে
- বিমানবন্দরে এ-রোগের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যেন বাইরে থেকে আসা কারোর মধ্যে এ-রোগ থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং তাকে সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করা যায়। বাংলাদেশে যাতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে সকলকে সচেতন হতে হবে। জ্বর-সর্দি-কাশি হলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। ভীত না-হয়ে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করা গেলে এ-রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এ-রোগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে বা এবিষয়ে যেকোনো সহায়তা চাইলে ঢাকার মহাখালিতে অবস্থিত রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর সাথে ০১৯৩৭০০০০১১ বা ০১৯৩৭১১০০১১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ■

চিকুনগুনিয়া

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি

চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এডিস মশার দ্বারা একজনের কাছ থেকে অন্যজনে এই রোগ ছড়ায়। এর লক্ষণ কিছুটা ডেঙ্গু জ্বরের মতো হওয়ায় অনেক চিকিৎসকই একে ডেঙ্গু ভেবে চিকিৎসা দেন। বাংলাদেশে এ-রোগ সাধারণ জনগণের কাছে খুবই অপরিচিত। তবে, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ঢাকার সুত্রাপুর, ধানমণ্ডি, মতিঝিল এবং মহাখালি এলাকায় ৬০০ লোকের ওপর এক জরিপ পরিচালনা করে। এই পরিসংখ্যান অনুসারে ৩৩ শতাংশ মানুষের

চিকুনগুনিয়ার বাহক এডিস মশা

দেহে চিকুনগুনিয়া রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এটি প্রমাণ করে যে, চিকুনগুনিয়া রোগের জীবাণু তাদের শরীরে ঢুকেছিলো এবং বাংলাদেশে এ-রোগের জীবাণুর উপস্থিতি রয়েছে।

বাংলাদেশে এ-রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০০৮ সালে রাজশাহীর পবা উপজেলায়। এই সময় পবা উপজেলার বেশ কিছু মানুষ জ্বর এবং মেরুদণ্ডের তীব্র ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। অন্যান্য রোগ থেকে একটু আলাদা মনে হওয়া এবং অধিকসংখ্যক রোগীর আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়ায় আইইডিসিআর থেকে একদল গবেষক সেখানে যান এবং সর্বপ্রথম একে চিকুনগুনিয়া বলে শনাক্ত করেন।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস

এটি একটি আলফা ভাইরাস এবং RNA ভাইরাস, যাতে E_1 নামের একটি এনভেলপ প্রোটিন পাওয়া গেছে। এই প্রোটিন এডিস মশার পেটের কোষে তাদের আটকে থাকতে সহায়তা করে।

রোগের ব্যাপ্তি

চিকুনগুনিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা গেলেও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এটি বেশি দেখা যায়। এছাড়াও, বিভিন্ন দেশে মাঝেমাঝে এ-রোগের প্রকোপ দেখা যায়। চিকুনগুনিয়া প্রথম ১৯৫২ সালে তানজানিয়াতে দেখা যায়। এরপর আফ্রিকা, এশিয়া, এমনকি বর্তমানে উত্তর আমেরিকাতেও এ-রোগ দেখা যায়। এশিয়া মহাদেশের ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, হংকং এবং মালয়েশিয়ায় এ-রোগ দেখা যায়।

রোগের বিস্তার

এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে চিকুনগুনিয়া ছড়ায় মশার কামড়ের মাধ্যমে। এডিস মশা রোগাক্রান্ত মানুষকে কামড়িয়ে অন্য মানুষকে কামড়ালে সে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এডিস প্রজাতির মেয়ে-মশারা সাধারণত এই ভাইরাস ছড়ায়। এখানে বলে রাখা ভালো যে,

এডিস মশা সাধারণত স্বচ্ছ পানিতে ডিম পাড়ে। বাসা-বাড়ির আশপাশে ছোট কৌটা বা পাত্রে যদি স্বচ্ছ পানি থাকে, তবে এ-মশা সেখানে বংশ বিস্তার করে। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, বাসার পাশে নারিকেলের খোলা, ফুলের টব বা ফুলদানি, পানি রাখার পাত্র, এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্র বা তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে জমে-থাকা পানি, টায়ার, প্লাস্টিকে জমে-থাকা পানিতে এরা ডিম পাড়ে। এই মশারা মূলত দিনের বেলায় কামড়ায়, তবে সকাল ও বিকেলে এরা বেশি সক্রিয় থাকে। বর্ষাকালে এ-রোগ ছড়ানোর সুযোগটা সবচাইতে বেশি কারণ এসময় মশার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। মানুষ চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের বাহক। তবে, কখনও কখনও বানর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী এবং পাখিও এ-রোগ বহন করে থাকে।

রোগের লক্ষণ

কোনো মানুষ চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার ঘন ঘন জ্বর হয়। দেহের তাপমাত্রা ১০১° থেকে ১০৩° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। তবে, এ-রোগে জ্বরের সাথে রোগীরা তাদের সমস্ত শরীর ও মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। জ্বর টানা ১২ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে অনেকসময় গায়ে ছোট-ছোট হালকা গোলাপী দানা (rash) দেখা দেয় (শিশুরা প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে সম্ভবত তাদের শরীরে ব্যথার জন্য)। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ থেকে শিশুদের ক্ষেত্রে চিকুনগুনিয়াকে আলাদা করা যায় না, কারণ শিশুদের শরীরে ব্যথার কথা বোঝার অন্য কোনো উপায় নেই। তবে, এসময় ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। তাদেরকে প্রতিটি লক্ষণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মা কিংবা অভিভাবকের কাছ থেকে রোগের পূর্ণ ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। গতানুগতিক চিকিৎসা দিলে বা ইতিহাস না-শুনে চিকিৎসা দিলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।

এ-রোগে ভাইরাস লিম্ফয়েড টিস্যু, লিভার, হাড়ের জোড়াগুলোতে প্রথমে বাসা বাধে এবং সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের মতো এ-রোগে প্লাটিলেটের কোনো সম্পর্ক নেই। লক্ষণীয় যে, এ-রোগে আক্রান্ত রোগীরা প্রায় সবাই কিছু অভিযোগ করে থাকে, যেমন:

- সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। তাই, জ্বরের সাথে রোগী শরীর ও পিঠব্যথা অনুভব করে। সাথে হাড়ের জোড়ার ব্যথার কথাও বলে
- গায়ে দানা এবং অনেক দিন ধরে জ্বর (দু'সপ্তাহ) থাকে

চিকুনগুনিয়ার রোগীর শরীরের র‍্যাশ

ডেঙ্গুর সাথে মিল ও পার্থক্য

রোগের লক্ষণ	চিকুনগুনিয়া	ডেঙ্গু
জ্বর	থাকবে	থাকবে
শরীরে দানা দেখা দেয়	১ থেকে ৪ দিনের মধ্যে	৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে
চোখে ব্যথা	থাকবে না	থাকবে
গিঁটে-গিঁটে ব্যথা	থাকবে	থাকবে না বা খুবই কম ক্ষেত্রে থাকবে
দানা থেকে সামান্য রক্তপাত	থাকবে না বা খুবই কম ক্ষেত্রে থাকবে	থাকবে, ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে

রোগনির্ণয়

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ল্যাবোরেটরিতে অনেকভাবে শনাক্ত করা যায়। তবে, নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতি বেশি প্রচলিত:

১. জ্বর শুরুর প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে রক্ত নিয়ে ল্যাব-এ IgM-এর উপস্থিতি ELISA method-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। এটি প্রাথমিকভাবে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শরীরে আছে কি না তা নিশ্চিত করে

২. আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য RT-PCR করা যায়, যার মাধ্যমে আরো নিশ্চিতভাবে ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়

চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাসজনিত রোগ। তাই, এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, এক্ষেত্রে জ্বর ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি।

জ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণত প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

ব্যথা কমানোর জন্য কোনো ওষুধ দেওয়ার আগে এতে বিদ্যমান উপাদান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা জরুরি, কারণ ওষুধ সঠিক না-হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এসপিরিন বা স্টেরয়েডজাতীয় নয় এমন ওষুধ সাধারণত এ-রোগে ব্যবহার করা হয় ব্যথা ব্যবস্থাপনার জন্য।

শরীরে ব্যথা কমানোর জন্য খুব হালকা ব্যায়াম করলে ভালো উপকার পাওয়া যেতে পারে। তবে, ভারী ব্যায়াম উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে আস্তে-আস্তে এ-রোগ সেরে যায়। একটি ভালো বিষয় হলো এ-রোগে মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি খুবই কম। তবে, অসুখ সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে। বড়দের ক্ষেত্রে ১ থেকে ২.৫ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে, ছোটদের ক্ষেত্রে এ-রোগ ৫ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সেরে যায়।

রোগ প্রতিরোধ

এ-রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই। তাই, প্রতিরোধই সবচাইতে ভালো। এজন্য আমরা:

- বাসার আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারি
- স্বচ্ছ পানি জমতে পারে এমন কিছু থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে পারি, যেমন ফুলের টবের অতিরিক্ত পানি, ফুলদানির পানি, তাপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের পানি, বাসার পাশে পড়ে-থাকা কৌটা, ডাবের খোল, ইত্যাদি
- যাদের বাসায় গাড়ি আছে তাদের অব্যবহৃত টায়ার সরিয়ে রাখা দরকার, কারণ এতে স্বচ্ছ পানি জমে থাকে এবং মশা সেখানে ডিম পাড়ে
- গ্রামে বা মফস্বলে ঝোপঝাড় পরিস্কার করে রাখতে পারি
- দিনের বেলা বা রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে পারি ■

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) এবং জরায়ুমুখের ক্যান্সার

ডাঃ আনাদিল আলম, আইসিডিডিআর,বি

এইচপিভি সম্পর্কে কিছু কথা

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) প্রজননতন্ত্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক শতাধিক প্রকারের এইচপিভি ভাইরাস রয়েছে যাদের মধ্যে কমপক্ষে ১৩টি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এবং এরা উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এইচপিভি ভাইরাস হিসেবে পরিচিত। যৌন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় মহিলা ও পুরুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন এবং তারা বারবার সংক্রামিত হতে পারেন।

যৌন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় হয়ে ওঠার পরপরই একজন মহিলা বা পুরুষের মধ্যে এই সংক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। যৌন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই সংক্রমণ ঘটলেও শুধু যে যৌনমিলনের (penetrative sex) মাধ্যমেই সংক্রমণ ঘটবে এমন কোনো কথা নেই, ত্বকের সাথে ত্বকের সংস্পর্শের মাধ্যমেও এই সংক্রমণ ঘটতে দেখা যায়।

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের প্রতীক সবুজ ফিতা

বিভিন্ন ধরনের এইচপিভি আছে এবং এদের সবগুলোই ক্ষতিকর নয়। কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক মাসের মধ্যে এই সংক্রমণ দূর হয়ে যায় এবং দু'বছর সময়ের মধ্যে প্রায় ৯০% সংক্রমণ দূর হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে।

এইচপিভি-সৃষ্ট রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় জরায়ুমুখের ক্যান্সার। জরায়ুমুখের প্রায় সব

ক্যান্সার উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এইচপিভি সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। দুই ধরনের এইচপিভি (১৬ এবং ১৮) ৭০% জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং ক্যান্সারপূর্ব জরায়ুমুখের ক্ষতের জন্য দায়ী।

লক্ষণ ও উপসর্গ

বেশিরভাগ এইচপিভি সংক্রমণ এবং জরায়ুমুখের ক্ষত বিনা চিকিৎসায় সেরে গেলেও সব মহিলার ক্ষেত্রেই সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ার এবং ক্যান্সারপূর্ব ক্ষতের ক্যান্সারে রূপ নেওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

নির্দিষ্ট কিছু এইচপিভি (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১৬ এবং ১৮) ক্যান্সারপূর্ব ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসা করা না-হলে এসব ক্ষত একসময় ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। তবে, এতে সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগতে পারে।

যেসব কারণে এইচপিভি-র দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার দেখা দিতে পারে

- অতি অল্পবয়সে প্রথম যৌনমিলন
- একাধিক যৌনসঙ্গী
- তামাকের ব্যবহার
- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম-থাকা (যেমন এইচআইভি-র রোগীদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বলে তাদের এইচপিভি সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে)

সমস্যার ব্যাপকতা

বাংলাদেশে মহিলা ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ জন মহিলা এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে প্রায় ৬,৫০০ জন মহিলা জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

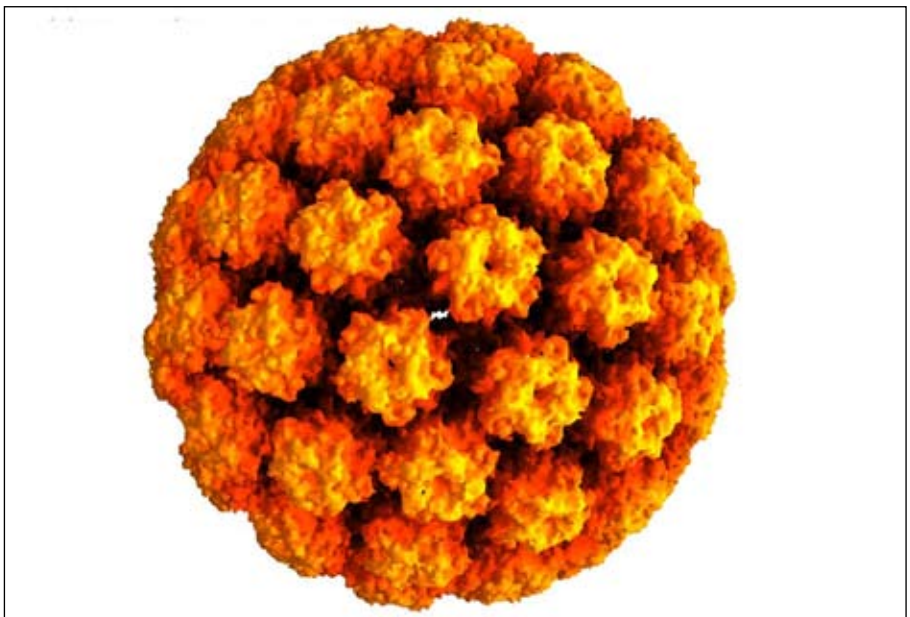
জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জীবাণুর আণবিক মডেল

ক্যান্সার একটু অগ্রবর্তী পর্যায়ে পৌঁছালেই কেবল এর উপসর্গগুলো দেখা দিতে শুরু করে। এসব উপসর্গের মধ্যে রয়েছে:

- অনিয়মিত, দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে অথবা যৌনমিলনের পর যোনিপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত
- পিঠ, পা অথবা কোমরে ব্যথা
- অস্বাভাবিক ক্লান্তি, ওজন কমে-যাওয়া এবং ক্ষুধামান্দ্য হওয়া বা ক্ষুধা কমে-যাওয়া
- যোনিপথে অস্বস্তি বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব; এবং
- একটি পা ফুলে-যাওয়া

জরায়ুমুখের ক্যান্সারের আরো অগ্রবর্তী পর্যায়ে আরো জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

উন্নত দেশসমূহে স্ক্রিনিং কার্যক্রম রয়েছে যার মাধ্যমে মহিলারা নিয়মিত পরীক্ষা করাতে পারেন এবং ক্যান্সারপূর্ব ক্ষত শনাক্ত করে তার চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। এসব দেশে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে ৮০% জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে কার্যকর পরীক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত যার ফলে এ-রোগটি গুরুতর পর্যায়ে না-পৌঁছানো এবং উপসর্গ দেখা না-দেওয়া পর্যন্ত রোগ সনাক্তকরণ হয়ে ওঠে না। কার্যকর স্ক্রিনিং কার্যক্রম এবং উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে জরায়ুমুখের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুহার অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

এইচপিভি-র টিকা

বর্তমানে দু'টি টিকা পাওয়া যায় যা এইচপিভি ১৬ এবং ১৮ ভাইরাস দু'টিকে প্রতিরোধ করে। এই এইচপিভি ১৬ এবং ১৮ শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। উল্লেখ্য, দু'টি টিকার একটি যোনিপথে ও পায়ুপথে আঁচিল সৃষ্টিকারী এইচপিভি ৬ এবং ১১-ও প্রতিরোধ করে থাকে।

বিভিন্ন চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, এই দু'টি টিকা নিরাপদ এবং এইচপিভি ১৬ এবং ১৮ দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণ প্রতিরোধে বেশ কার্যকর।

টিকা দু'টি বাংলাদেশে পাওয়া যায় যা জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে ৯ থেকে ২৬ বছর-বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

এইচপিভি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগে এই টিকা গ্রহণ করা হলে বেশি কার্যকারিতা পাওয়া যায়। কাজেই, প্রথমবারের মতো যৌন ক্রিয়াকলাপ শুরু করার আগে এই টিকা নেওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, এই টিকা এইচপিভি ১৬ এবং ১৮ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, কিন্তু ক্যান্সারের বা এইচপিভি-সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসা করতে পারে না।

এইচপিভি টিকাদান জরায়ুমুখের ক্যান্সার স্ক্রিনিং পরীক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা নয়। যেসব দেশে এইচপিভি-র টিকা রয়েছে, সেখানে স্ক্রিনিং পরীক্ষা কার্যক্রমও গড়ে তোলা এবং জোরদার করা বাঞ্ছনীয়।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার পরীক্ষা

যেসব মহিলার মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না এবং যারা সুস্থ বোধ করেন, জরায়ুমুখের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা এবং ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়। ক্যান্সারপূর্ব ক্ষত শনাক্ত করা হলে খুব সহজেই তার চিকিৎসা করে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়। স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যান্সারও শনাক্ত করা যায় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

ক্যান্সারপূর্ব ক্ষতের সৃষ্টি হতে অনেক বছর লাগে বলে ৩০ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সব

মহিলাদের জন্য জীবনে অন্তত একবার স্ক্রিনিং পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। সম্ভব হলে আরো ঘনঘন এই পরীক্ষা করানো দরকার।

বর্তমানে তিন ধরনের স্ক্রিনিং পরীক্ষা করা হয়ে থাকে:

- প্যাপ টেস্ট এবং লিকুইড-বেইজড সাইটোলোজি
- অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ (ভায়া পরীক্ষা)
- উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এইচপিভি-র ধরনসমূহের জন্য এইচপিভি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সরকার ভায়া পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ুমুখের ক্যান্সার শনাক্তকরণের জন্য স্ক্রিনিং কার্যক্রম চালু করেছে। ভায়া পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ একটি পরীক্ষা। এর জন্য স্বল্প অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন হয় এবং পরীক্ষার সাথে সাথে রিপোর্ট পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, কিছু উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ারসমূহে পাওয়া যাচ্ছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা ৩০ ও তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের পরীক্ষা করছেন। ভায়া-পজিটিভ মহিলাদেরকে বিএসএমএমইউ এবং নানাবিধ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে ৮০-৯৬ শতাংশ রোগীর ক্যান্সারপূর্ব ক্ষত ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসাপ্রাপ্ত প্রত্যেক মহিলাকে পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত প্রতিবছর একবার পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। অস্বাভাবিকতা পুরোপুরি দূর হয়েছে কি না তা দেখার জন্য এই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা

যৌন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের আগে ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সের মেয়েদেরকে এইচপিভি টিকা দেওয়া প্রয়োজন। ছেলে ও মেয়েদের জন্য অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে:

- তামাকের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কীকরণ যা অনেকসময় বয়ঃসন্ধির সময় শুরু হয় এবং যা জরায়ুমুখ ও অন্যান্য ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য ঝুঁকি হিসেবে কাজ করে
- দেরিতে যৌন কার্যকলাপ শুরু করাসহ নিরাপদ যৌন কার্যকলাপ-সংক্রান্ত শিক্ষা
- যৌনমিলনের ক্ষেত্রে কনডমের ব্যবহার-সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নয়ন; এবং
- পুরুষদের খতনা বা মুসলমানি

যৌনকার্যে সক্রিয় মহিলাদের জরায়ুমুখে অস্বাভাবিক কোষ বা ক্যান্সারপূর্ব ক্ষত আছে কি না তা শনাক্ত করার জন্য স্ক্রিনিং পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অস্বাভাবিক কোষ বা ক্ষত দূর করার জন্য ক্রায়োথেরাপির সাহায্য নিতে হবে। ক্রায়ো-থেরাপি অস্বাভাবিক টিস্যুর বর্ধন রোধ করে এগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার দেখা দিলে শল্যচিকিৎসা, রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ■

শিশুদের জ্বরজনিত খিঁচুনি

ডাঃ রাবেয়া রহমান, আইসিডিডিআর,বি

জ্বরজনিত খিঁচুনি সাধারণত দেখা যায় অতিমাত্রায় জ্বরে ভুগছে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে। যেসব শিশু কানের প্রদাহ, সংক্রমণ, ঠাণ্ডা, সর্দি, ইত্যাদিতে খুব বেশি মাত্রায় ভুগে থাকে, সেইসব শিশুরাই জ্বরজনিত খিঁচুনিতে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে, আরো কিছু মারাত্মক সংক্রমণও এই খিঁচুনির কারণ হতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, ইত্যাদি।

এই ধরনের খিঁচুনির ক্ষেত্রে আসল কারণগুলো শনাক্ত করে যদি চিকিৎসাসেবা দেওয়া যায়, তবে, কোনো-রকম স্থায়ী ক্ষতি ছাড়াই শিশুকে সুস্থ করা যায়।

জ্বরজনিত খিঁচুনি কেন হয় এবং কাদের হয়?

শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এমন যেকোনো অসুখই আসলে এই ধরনের খিঁচুনির জন্য দায়ী। এটি আসলে কোনো অসুখ নয়, অন্য কোনো অসুখের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কতগুলো রোগ আছে যেগুলো খিঁচুনির কারণ হিসেবে চিহ্নিত, যেমন:

১. কানের প্রদাহ এবং সংক্রমণ

২. সর্দি, কাশি এবং ঠাণ্ডা-লাগা

৩. ইনফ্লুয়েঞ্জা

৪. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোনো অসুখ

৫. নিউমোনিয়া

৬. মেনিনজাইটিস

৭. কিডনির সংক্রমণ

সাধারণত ছয় বছর বয়সের আগে শতকরা ৩টি শিশু এই ধরনের খিঁচুনিতে ভুগে থাকে। তবে, খিঁচুনি বেশি হতে দেখা যায় ১৮ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যে। সাধারণত ৬ মাস বয়সের নিচে এবং ৬ বছরের পরে জ্বরজনিত খিঁচুনি কম হতে দেখা যায়। জ্বরজনিত খিঁচুনি ৩ ধরনের হতে পারে:

১. সাধারণ খিঁচুনি (২০ জন আক্রান্ত শিশুর মধ্যে ১৫ জনের ক্ষেত্রে): এই ধরনের খিঁচুনিই সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। শিশুর শরীর এতে লালচে রঙ ধারণ করতে পারে, শরীর শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং শরীর আঁকাবাঁকা আকার ধারণ করতে পারে। তবে, এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কয়েক সেকেন্ড থেকে শুরু করে ৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না। শিশুরা কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। জ্বর কমে গেলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শিশু সুস্থ বোধ করতে শুরু করে। এই ধরনের খিঁচুনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বারবার ফিরে আসে না।

২. অল্প জটিল ধরনের খিঁচুনি (২০ জন শিশুর মধ্যে ৪ জনের ক্ষেত্রে): এটিও সাধারণ খিঁচুনির মতো। তবে, এতে আরো কিছু উপসর্গ দেখা যেতে পারে, যেমন:

- খিচুনির স্থায়িত্ব ১৫ মিনিট কিংবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিকবার ঘটতে পারে
- সারা শরীরে খিঁচুনি দেখা দিতে পারে
- আংশিক খিঁচুনিও হতে পারে, যেমন শুধু এক পা কিংবা এক হাত

৩. জটিল ধরনের খিঁচুনি (২০ জন শিশুর মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে): এক্ষেত্রে খিঁচুনির সময়সীমা বেড়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যা করা যেতে পারে তা হলো:

- কখন শুরু হলো তা খেয়াল করতে হবে
- মাথার দিকটা নিচু রেখে শিশুকে শুইয়ে দিতে হবে

- মুখে কোনো খাবার দেওয়া যাবে না
- খিঁচুনির সময় শিশুকে ঝাঁকানো যাবে না এবং শিশুকে বাঁকা করা যাবে না
- খিঁচুনির সময় শিশুর মাথায় পানি ঢেলে এবং নরম সুতি-কাপড় ভিজিয়ে গা মুছে দেওয়া উচিত এবং তাকে ঢিলেঢালা কাপড় পরানো উচিত

প্রাথমিক চিকিৎসার পর কী কী করণীয়

শিশুকে ভালোমত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে:

- একবার খিঁচুনির পর শিশুর অবস্থার উন্নতি না-হলে
- একবার খিঁচুনির পর যদি আবারও তা হতে থাকে
- শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়

জ্বরজনিত খিঁচুনির চিকিৎসা

খিঁচুনি যদি নিজে থেকেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভালো হয়ে যায়, তবে কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। তা না-হলে:

- শিশুর গায়ের কাপড় আলগা করে দিতে হবে। ঘর গরম থাকলে শিশুর গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে দেওয়া যেতে পারে
- Paracetamol suppository দিতে হবে
- ঠাণ্ডা পানীয় পান করাতে হবে
- জ্বরের আসল কারণ বের করে মূল রোগের চিকিৎসা করতে হবে

শিশুর খিঁচুনি

জ্বরজনিত খিঁচুনি কি বারবার ঘটতে পারে?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি একবারই ঘটে থাকে। তবে, প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে অন্তত ৩ জনের ক্ষেত্রে জ্বরের সময় আবারো এটি হতে পারে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, জ্বরজনিত খিঁচুনি হয়েছিলো এমন ১০টি শিশুর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড জ্বরের সময় তাদের আবারো দুই থেকে তিনবার খিঁচুনি হয়েছিলো। এই খিঁচুনিতে পারিবারিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোনো স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে কি?

সাধারণত এ-রোগে কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না। রোগ-পরবর্তী কোনো ক্ষতি ছাড়া পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে যে অসুখের কারণে খিঁচুনি হচ্ছে তার মাধ্যমে ক্ষতি হতে পারে। সেজন্য, যে কারণে জ্বর হচ্ছে তার চিকিৎসা করা জরুরি। ■

ধুমপান বিষপানের সামিল

এম মতিউর রহমান
প্রাক্তন ফিজিশিয়ান ম্যানেজার, স্টাফ ক্লিনিক, আইসিডিডিআর,বি

বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় কয়েক হাজার রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য সরাসরি দায়ী। তাছাড়া, নিকোটিন ও কার্বন মনোক্সাইড-নামক যে দু'টি ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে, সেগুলো মানুষের শরীরে নানারকম মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে:

ক্যান্সার: ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, গলনালী, জিহ্বা, মুখ-গহ্বর, ঠোঁট, ইত্যাদি অঙ্গের ক্যান্সারের জন্য ধুমপানই প্রধানত দায়ী

হৃদরোগ: ধুমপান হার্ট অ্যাটাকের একটি অন্যতম কারণ

স্ট্রোক: স্ট্রোকের অনেক কারণের মধ্যে ধুমপান একটি প্রধান কারণ। ধুমপানের ফলে মস্তিষ্কের রক্তনালী ও রক্তপ্রবাহে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে স্ট্রোক হয়ে থাকে

উচ্চ রক্তচাপ: ধুমপানের ফলে শরীরে গৃহীত নিকোটিন হৃৎকম্পন (হার্টবিট) স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং অনেকের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে।

ফুসফুসের অন্যান্য রোগ: ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসিমা কর-পালমোনারি, ইত্যাদি মারাত্মক রোগ ধুমপানের ফলে হতে পারে।

রক্তনালীর বিশেষ রোগ: বিড়ি-সিগারেটের নিকোটিনের ফলে রক্তনালীর মাংসের সংকোচন হয় এবং রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফলে 'বার্জাস ডিজিজ' নামক মারাত্মক রোগ হতে পারে। এ-রোগে অনেক সময় পা বা হাত কেটে ফেলে দিতে হয়।

বুদ্ধি এবং অনুভূতির উপর ধুমপানের প্রভাব: ধুমপানের মাধ্যমে শরীরে গৃহীত কার্বন মনোক্সাইড শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচলে এবং অক্সিজেন সরবরাহে যে বিঘ্ন ঘটায় তার ফলে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে অসুবিধাসহ বুদ্ধিমত্তা এবং বিচার-বিবেচনায়ও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভবতী মহিলা ধুমপান করলে অকাল গর্ভপাত, গর্ভস্থিত শিশুর মৃত্যু এবং শিশুর জন্ম-ওজন কম হতে পারে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।